রবীন্দ্রনাথের চোখে ‘নারী’

ডঃ হুমায়ুন আজাদ

পর্ব-৪

‘কেন্দ্রানুগ : কেন্দ্রাতিগ’ পরিভাষা ব্যবহার ক’রে রবীন্দ্রনাথ যে কথাটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে আকর্ষনীয় করার চেষ্টা করেছেন, তার সরল বাঙলা অনুবাদ হচ্ছে যে নারীর জগত ঘরে, আর পুরুষের জগত বাইরে। নিউটনীয় সৌরজগতের সাথে ভিক্টোরীয়দের মতো তিনি সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন পরিবারের, এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন নারীপুরুষের পৃথক জগত ভূমিকা। তবে এটা বিজ্ঞান নয়, অপবিজ্ঞান। সভ্যতার সংকটের জন্যে তিনি দায়ী করেছেন নারীকে ... ... প্রথা হিশেবে যা চ’লে এসেছে, তাকেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন পদার্থ বিজ্ঞানের ধ্রুব সূত্র!

পূর্ববর্তী পর্বের পর .....

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস কিছু মানুষ জন্মে প্রভু হয়ে, আর কিছু মানুষ জন্মে দাস হয়ে; তাই তিনি মনে করেন, ‘কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী অধীনতা মানুষকে সহ্য করতেই হয়।’ নারীর পুরুষাধীনতা, তাঁর মতে, অবশ্যম্ভাবী, তা নারীকে সহ্য করতেই হবে; শুধু তাই নয়, পুরুষাধীনতাই নারীর জন্যে ধর্ম। পুরুষতন্ত্রের অবিচল অনুসারী রবীন্দ্রনাথ স্বামীকে দেখেন নারীর অবতাররূপে, যাকে ভক্তি করা নারীর জন্যে ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের চোখে পরিবার, সামাজিক সংস্থা নয়, দেবমন্দির, যার অধিষ্ঠিত দেবতার নাম স্বামী; স্ত্রী তার জন্মজন্মান্তরের, ভক্ত :

> *পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম। আজকাল একরকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসার সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্ছে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্ছে। কর্তব্যের অনুরোধে যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সে তো স্বামীর অধীন নয়, সে কর্তব্যের অধীন।*

ধর্ম যে বড়ো প্রতারনা ও পুরুষতন্ত্রের বলপ্রয়োগসংস্থা, তা মনে জাগার কথা নয় প্রথা ও পুরুষাধিপত্যবাদী রবীন্দ্রনাথের; তিনি বরং দাসত্বকেই মহিমান্বিত করেছেন ধর্মরূপে। স্বামীস্ত্রী মিলে গ’ড়ে তোলে একটি সামাজিক সংস্থা-পরিবার, তাতে ভক্তির কথা ওঠে না; তবে পুরুষ নারীকে দাসী ক’রেই স্বস্তি পায় নি, নিজেকে দেবতার স্তরে উঠিয়ে স্ত্রীর আনুগত্যকে ক’রে তুলেছে ঐশ্বরিক। শুধু আনুগত্যে নিশ্চিন্ত বোধ করেন না রবীন্দ্রনাথ, তিনি চান নিশ্চিত ভক্তি, কেননা ভক্তি হচ্ছে আত্মবিসর্জনের বা সত্তাবিলোপের চূড়ান্তরূপ। ‘পতিভক্তি’র মতো একটি মধ্যযুগীয় ধারণা ও শব্দ যে তিনি ব্যবহার করেছেন, তা আমাদের খুব বিস্মিত করে। স্বামীর অধীনতাকে তিনি বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছেন আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক দু-রকম যুক্তি দিয়েই : স্বামীর অধীনে থাকা নারীর জন্য একদিকে আধ্যাত্মিক ধর্ম, আরেকদিকে ইহজাগতিক কর্তব্য! দু-ধরনের শিকলেই নারীকে বেঁধেছেন তিনি। মনে রাখা দরকার যে এ-রবীন্দ্রনাথ আশি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ নন, এর বয়স উনত্রিশ! সংসার সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়ার জন্যে তিনি দোষী করেছেন আজকালকার ‘একরকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষা’কে। রবীন্দ্রনাথ যাকে ‘নিষ্ফল ঔদ্ধত্য’ বলেছেন, তা

ঔদ্ধত্য নয়, অধিকার দাবি; এবং গত একশো বছরে প্রমানিত হয়েছে যে তা নিষ্ফল নয়, বেশ সফল। তিনি যাকে 'অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষা' বলেছেন তা অগভীর নয়, ভ্রান্ত তো নয়ই; তা-ই প্রকৃত শিক্ষা; আর রবীন্দ্রনাথ নারীর জন্যে যে শিক্ষার কথা ভেবেছেন, তার গভীরতা- অগভীরতার কথাই ওঠে না, কেননা তা আসলে কোনো শিক্ষাই নয়।

স্বামীকে যিনি মনে করেন নারীর দেবতা, তিনি যে অবধারিত ভাবে হবেন নারীমুক্তির বিরোধী, এটা আগে থেকেই ধ'রে নিতে পারি; আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাই। তিনি নারীমুক্তির বিরোধী হয়ে ওঠেন বিলেত থেকে ফেরার পরপরই; তাই তিনি মেনে নিতে পারেন নি নারীমুক্তি-আন্দোলনকারীদের। নারীদের আধুনিক শিক্ষা দেয়ারও তিনি ছিলেন বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ জীবনে নানা ধরনের প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করেছেন, তারা সবাই যে তাঁর সত্যিকার প্রতিপক্ষ ছিলো এমন নয়; অনেক সময় তিনি নিজেই ছিলেন প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষের সাথে রবীন্দ্রনাথের লড়াইয়ের রীতি হচ্ছে তিনি প্রতিপক্ষকে আক্রমন করেন, তারপর উপহাস আর ব্যঙ্গ করেন। যদিও নারীমুক্তি-আন্দোলনকারীরা তাঁর সাথে কোনো লড়াইয়ে লিপ্ত হন নি, তবুও তিনি এগিয়ে গিয়ে লড়াইয়ে নামেন তাঁদের সাথে; এবং উপচে পড়ে তাঁর পুরুষতান্ত্রিক ঘেন্না :

> *আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগতই নাকী সুরে বলছে, আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাতে করে কেবল এই হচ্ছে যে, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধবন্ধনহীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে; অথচ সে-বন্ধন ছেদন করবার কোনো উপায় নেই।*

তাঁর অবজ্ঞা আর ঘেন্না দেখে মনে হয় তিনি কোনো আসন্ন বিপর্যয়ের মুখে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন শেষ খড়কুটো। তাঁর সংবেদনশীলতার অভাবও শোচনীয়; নারীমুক্তির দাবি তাঁর কাছে উপহাসের ব্যাপার- 'নাকী সুরে' বিলোপ। মনে হচ্ছে আদি-মধ্য-আধুনিক সমস্ত পুরুষতন্ত্রের পক্ষে দাড়িয়ে তিনি ঠেকাবেন নারীমুক্তি। তিনি ধ'রেই নিয়েছেন নারীদের মুক্তি কখনো ঘটবে না, বা নারীদের মুক্তি ঘটা অনুচিত ও ক্ষতিকর। তিনি যাকে বলেছেন 'স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধবন্ধন', তা প্রভু ও এক বা একাধিক দাসীর বন্ধন, যাতে বাঁধা নারী। তিনি ঔই বন্ধনের হীনতাপ্রাপ্তির ভয়ে উদ্বিগ্ন, যদিও সত্য হচ্ছে আন্তরিক ভাবে ঔই বন্ধন কখনো উন্নত ছিলো না। নারীমুক্তির ব্যাপারটিকে ভুলও বুঝেছেন রবীন্দ্রনাথ; তিনি মনে করেছেন নারীমুক্তির অর্থ হচ্ছে নারীরা বিয়ে করবে না। এমন একটা ভয় অবশ্য ছিলো ভিক্টোরীয়দের মনে; তারা মনে করতো নারী যদি মুক্তি পায়, পুরুষের পেশা অধিকার করে, সমান হয়ে ওঠে পুরুষের, তবে তারা বিয়ে করতে অস্বীকার করবে। এটাও নারী সম্পর্কে পুরুষের ভুল ধারণার ফল : পুরুষ নিজের কামকেই প্রধান ক'রে দেখে দমিয়ে রেখেছে নারীর কাম, মনে করছে কাম নারীর জন্যে খুবই গৌন ব্যাপার, ওটা না হ'লেও চলে নারীর। তাই নারী যদি স্বায়ত্তশাসিত হয়, তবে নারীর বিয়ের কোনো দরকার পড়বে না; তখন পুরুষ তার মহৎ কামের অগ্নিতে জ্বলবে একলা। নারী মুক্তি চেয়েছে পুরুষের অধীনতা থেক, বিয়ে থেকে নয়; তবে বিয়ে যে করতেই হবে, মাংসকে সুখী করার জন্যে বিয়ে যে বিকল্পহীন উপায়, তাও নয়। বিয়ে একটি প্রথা।

তিনি ভিক্টোরীয়দের মতো প্রকৃতির দোহাই দেন বারবার, ঘোষনা করেন প্রকৃতির বিধান বা নারীর নিয়তি হচ্ছে পুরুষাধীনতা :

> *নানা দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, সংসার কল্যান অব্যাহত রেখে স্ত্রীলোক কখনো পুরুষের*

> আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে না। প্রকৃতি এই স্ত্রীলোকের অধীনতা কেবল তাদের ধর্মবুদ্ধির উপরে রেখে দিয়েছেন তা নয়, নানা উপায়ে এমনই আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে, সহজে তার থেকে নিষ্কৃতি নেই। অবশ্য পৃথিবীতে এমন অনেক মেয়ে আছে পুরুষের আশ্রয় যাদের আবশ্যক করে না, কিন্তু তাদের জন্যে সমস্ত মেয়ে–সাধারণের ক্ষতি করা যায় না।

নারীকে পুরুষের অধীনে থাকতে হবে 'সংসার কল্যাণ অব্যাহত' রাখার জন্যে, ও নারীর বিবেকের আদেশে; তবে নির্বোধ নারী সংসারকল্যাণের কথা প্রাজ্ঞ পুরুষের মতো অতোটা ভাবতে নাও পারে, আর বিবেক বা 'ধর্মবুদ্ধি' নাও থাকতে পারে তার; তাই রাবীন্দ্রিক প্রকৃতি আগে থেকেই নিয়েছে উপযুক্ত ব্যবস্থা;- পুরুষের অধীনে রাখার জন্যে প্রাকৃতিক শেকলে বেঁধে নারীকে পাঠিয়েছে পুরুষের কারাগারে! প্রকৃতি পুরুষের ধর্মবুদ্ধির ওপর আস্থাশীল, তাই আটঘাট বেঁধে পুরুষকে পাঠায়নি; কিন্তু প্রকৃতি নারীকে বিশ্বাস করে না, প্রকৃতির আস্থা নেই নারীর ধর্মবুদ্ধিতে, তাই নারীকে করেছে দুর্বল, তাকে দিয়েছে প্রতি মাসের মাসিকের মত বিশ্রি ব্যাপার, দিয়েছে নিজের ভেতরে মানুষ জন্মানোর শাস্তি! তাই উদ্ধার নেই নারীর, তাকে মেনে নিতে হবে পুরুষের অধীনতা! নারীকে থাকতে হবে পুরুষের আশ্রয়ে; রবীন্দ্রনাথের মতে নারীর জন্যে এটাই লাভজনক, মুক্তি নারীর জন্য ক্ষতিকর। প্রগতিবিরোধী হিন্দু ও ভিক্টোরীয় মানসিকতার মিশ্ররূপ মূর্ত দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তিনি অবশ্য বলেছেন যে তাঁর মতের সাথে 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কোনো বিরোধ নেই'; তবে বিরোধ রয়েছে প্রচন্ড, কেননা তিনি 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা' বলতে যা বোঝেন, তা শিক্ষাও নয়, স্বাধীনতা নয়।

রবীন্দ্রনাথ আটাশ-উনত্রিশ বছর বয়সে হয়ে ওঠেন চমৎকারভাবে প্রগতিবিরোধী। উনত্রিশ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার বিলেত যান তিনি, তবে তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় বিলেতযাত্রার মধ্যে রয়েছে দু-মেরুর বৈপরীত্য : প্রথমবার তিনি গিয়েছিলেন ইউরোপের কাছে শিখতে, দ্বিতীয়বার যান ইউরোপকে শেখাতে, যদিও ইউরোপকে শেখানোর কাজটি করেন তিনি মনে মনে। নিজেকে তিনি গণ্য করেন এক তরুণ ভারতীয় গুরু ব'লে, যিনি ইউরোপ সম্পর্কে তৈরি ক'রে ফেলেছেন বা আহরণ করেছেন এমন এক ভুল দর্শন যে কর্ম-আবিষ্কার-উন্নতি মানুষকে অসুখী করে, আর ইউরোপ যেহেতু ওইসব করেছে, তাই ইউরোপ খুব অসুখী! দ্বিতীয়বারের বিলেত যাত্রার বিবরণ লেখেন তিনি *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়রিতে* (১৮৯১), যার খসড়া অংশে প্রকাশ পায় ইউরোপ ও নারী সম্পর্কে তাঁর পুরোনো ভারতীয় বদ্ধ মানসিকতা। তিনি পরে তা বাদ দেন বই থেকে; তবে নারী সম্পর্কে তাঁর ওই সময়ের মত মেলে *প্রাচ্য ও প্রতীচ্য* (১২৯৮, রর : ১২, ২৩৬-২৫০) প্রবন্ধে। তিনি বলেন, 'য়ুরোপে সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্ছে স্ত্রীলোক ততই অসুখী হচ্ছে', যা শুনলে মনে হয় সুখ সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ এক মহর্ষি বলেছেন জীবনের সারকথা। এখানে অবশ্য তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন রুশো, যাঁর মতে সভ্যতা কৃত্রিম ব্যাপার, যা মানুষকে নষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ একে একটু সংশোধন ক'রে প্রয়োগ করেছেন ইউরোপের নারীর ক্ষেত্রে। তাঁর উক্তি পুরোপুরি ভুল ধারণার ফল : 'সুখ' ব্যাপারটিই বিভ্রান্তিকর, কেননা তা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত; আর সভ্যতার অগ্রসরতা নারীপুরষ উভয়েরই জন্যে হয়েছে কল্যাণকর। তাঁর কথার মধ্যে রয়েছে এক গোপন তুলনাও;- তিনি বলতে চান ভারতে সভ্যতা এগোচ্ছে না ব'লে ভারতীয় নারীরা খুব সুখে আছে!

রবীন্দ্রনাথ নারীকে পুরুষের অধীনে ও ঘরে আটকে রাখার জন্যে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক কোনো অস্ত্রই অব্যবহৃত রাখেন নি; এবং শেষ অস্ত্রটি, আধুনিক কালে যার মহিমা শেষ নেই, সেই বৈজ্ঞানিক অস্ত্রটিও ব্যবহার করতে ভোলেন নি। তিনি নিউটনীয় সৌরলোকের দু-রকম শক্তির রূপ দেখেছেন নারীপুরুষের মধ্যে :

স্ত্রীলোক সমাজের কেন্দ্রানুগ (centripetal) শক্তি; সভ্যতার কেন্দ্রাতিগ সমাজকে বহির্মুখে যে-পরিমানে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, কেন্দ্রানুগ শক্তি অন্তরের দিকে সে-পরিমানে আকর্ষন করে আনতে পারছে না। ..... স্ত্রীলোকের রাজত্ব ক্রমশ উজাড় হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

'কেন্দ্রানুগ : কেন্দ্রাতিগ' পরিভাষা ব্যবহার ক'রে রবীন্দ্রনাথ যে কথাটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে আকর্ষনীয় করার চেষ্টা করেছেন, তার সরল বাঙলা অনুবাদ হচ্ছে যে **নারীর জগত ঘরে, আর পুরুষের জগত বাইরে।** নিউটনীয় সৌরজগতের সাথে ভিক্টোরীয়দের মতো তিনি সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন পরিবারের, এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন নারীপুরুষের পৃথক জগত ভূমিকা। তবে এটা বিজ্ঞান নয়, অপবিজ্ঞান। সভ্যতার সংকটের জন্যে তিনি দায়ী করেছেন নারীকে : পুরুষ তার সাফল্যের জন্যে বেরিয়ে পড়েছে বাইরে, শেষ নেই তার কর্ম-উত্তেজনার, কিন্তু নারী ঘরকে আকর্ষনীয় করে তুলতে পারছে না ব'লে পুরুষ ঘরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে না। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ছন্দ, দেখা দিচ্ছে সভ্যতার সংকট। এর জন্যে দায়ী নারী। পুরুষ তো বেরিয়ে পড়বেই, নারীর কাজ তাকে ঘরে ফিরিয়ে এনে সুখশান্তিতে ভ'রে দেয়া, কিন্তু নারী তা আর পারছে না। রাসকিনও নারীপুরুষকে দেখেছেন এভাবেই। রুশো, রাসকিন ও আরো অসংখ্য ভিক্টোরীয়র মতো রবীন্দ্রনাথ নারীকে দেখেছেন ঘরের সম্রাজ্ঞীরূপে, তিনি চান নারী থাকুক সেখানেই; নারী ঘরে না থাকলেই নষ্ট হয় সমাজের সামঞ্জস্য। নারীপুরুষকে এমন কেন্দ্রানুগ: কেন্দ্রাতিগ, ঘর : বাইর ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকায় ও ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য একটিই : নারীকে পুরুষের অধীনে রাখা। নারী কেনো হবে কেন্দ্রানুগ, তার কেন্দ্রাতিগ হওয়ার কোনো বাধা নেই; পুরুষ কেনো হবে শুধু কেন্দ্রাতিগ, তার কেন্দ্রানুগ হওয়ার কোনো বাধা নেই। নারীপুরুষ একই সাথে হ'তে পারে ঘর ও বাইর, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ; কিন্তু পুরুষতন্ত্র তা ভাবতে পারে না। প্রথা হিশেবে যা চ'লে এসেছে, তাকেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন পদার্থ বিজ্ঞানের ধ্রুব সূত্র!

[চলবে]